অবক্ষয়ের চোরাবালি ও একটি বৌদ্ধিক বিপ্লবের আহ্বান

আলো-ছায়ার অবয়ব এবং একটি অন্ধকারের ব্যবচ্ছেদ।

ক্যামেরার লেন্স যখন আলো আর ছায়াকে ভাগ করে, তখন অবয়বের চেয়ে বেশি স্পষ্ট হয়ে ওঠে ভেতরের মানুষটা। এই সাদা-কালো ফ্রেমে নিজেকে যখন দাঁড় করাই, তখন চারপাশের সমাজটাকে বড় বেশি চেনা অথচ অচেনা লাগে। চিবুকে হাত রেখে যে দৃষ্টি আজ দূরের কোনো অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আছে, সেই অন্ধকারটা আসলে আমাদের চারপাশের চেনা সমাজেরই এক প্রতিচ্ছবি।

আমরা এমন এক অদ্ভুত এবং অবক্ষয়ের সময়ে বাস করছি, যেখানে প্রতিদিন সকালবেলা খবরের কাগজ খুললেই বা হাতের ডিজিটাল স্ক্রিনটা অন করলেই কিংবা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের টাইমলাইনে চোখ বোলালেই বুকটা কেঁপে ওঠে। শিশু হত্যা, নির্যাতন, ধর্ষণ আর খুনের মতো নৃশংস ঘটনা এখন আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের স্বাভাবিক অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি হলো, এই চরম অপরাধগুলো যখন ঘটে এমন সব মানুষের হাত ধরে, যাদের সমাজ একসময় পবিত্রতার প্রতীক কিংবা ‘কোরআনের পাখি’ বলে ডেকেছিল।

শৈশবের নিষ্পাপ মুখে যারা একদিন পবিত্র বাণী আউড়েছে, ক্ষমতার লোভে বা বিকৃত মানসিকতায় অন্ধ হয়ে আজ তারাই যখন রক্ষক থেকে ভক্ষক হয়ে ওঠে, তখন থমকে দাঁড়াতে হয়। ধর্মের বাহ্যিক লেবাস পরে, মুখে আধ্যাত্মিকতার বুলি আউড়ে ভেতরের শয়তানকে আড়াল করার এই যে চাতুর্য—তা সমাজকে ভেতর থেকে পচিয়ে দিচ্ছে। যাদের একদিন আলোর পথে হাঁটার কথা ছিল, তাদেরই একটা অংশ আজ অন্ধকারের সবচেয়ে বড় কারিগর। এটা কোনো নির্দিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক ব্যর্থতা নয়, আমাদের সামগ্রিক নৈতিকতার চরম পরাজয়।

মূর্খ সমাজ অনেক সময় অন্ধবিশ্বাসে অন্ধ হয়ে অপরাধীকে আড়াল করে, কিন্তু একজন সচেতন মানুষের চোখ কখনো এই ভন্ডামিকে মেনে নিতে পারে না।

এই ছবিতে যে আলো আর অন্ধকার দেখছেন, তা কেবল ফটোগ্রাফির টেকনিক নয়। ওটা আসলে আমাদের চারপাশের জীবনেরই গল্প। আলোটুকু আমাদের ভেতরের হারিয়ে যাওয়া বিবেক, আর অন্ধকারটুকু আমাদের চারপাশের এই

নির্মম বাস্তব।

অন্ধকারের গ্রাস থেকে পরিত্রাণের পথ এবং বৌদ্ধিক বিপ্লবের ডাক

এই যে চারপাশের অন্ধকার, অবক্ষয় আর পচন—এ থেকে আমাদের মুক্তির উপায় কী? শুধু ফেসবুকের ওয়ালে ক্ষোভ প্রকাশ করলেই কি সমাজ বদলে যাবে? নিশ্চয়ই না। এই সামাজিক মহামারী থেকে বাঁচতে হলে আমাদের যেমন বিচারহীনতার সংস্কৃতি ভাঙতে হবে, তেমনই প্রয়োজন এক মহা বৌদ্ধিক বিপ্লবের।

প্রথমত, আমাদের দেশের আইন ও বিচার ব্যবস্থার কঠোরতম প্রয়োগ প্রয়োজন। অপরাধী যখন দেখে অপরাধ করেও সে পার পেয়ে যাচ্ছে, তখনই তার সাহস বেড়ে যায়। শিশু নির্যাতন ও ধর্ষণের মতো জঘন্য অপরাধের বিচার হতে হবে বিশেষ ট্রাইব্যুনালে এবং তা দ্রুততম সময়ে কার্যকর করতে হবে। দৃষ্টান্তমূলক ও কঠোরতম শাস্তি যখন প্রকাশ্য হবে, তখন লেবাসধারী বা পরিচয়ধারী যেকোনো শয়তানের বুক কেঁপে উঠবে। কোনো রাজনৈতিক বা সামাজিক প্রভাব যেন এই নরপশুদের বাঁচাতে না পারে, তা নিশ্চিত করতে হবে।

একই সাথে আমাদের “লেবাস সর্বস্ব” ভক্তি থেকে বের হয়ে আসতে হবে। অপরাধীর কোনো ধর্ম হয় না। ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা বা অন্ধবিশ্বাসের দোহাই দিয়ে এই অপরাধীদের আড়াল করার মানসিকতা সমাজ থেকে উপড়ে ফেলতে হবে।

দ্বিতীয়ত, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ও পারিবারিক মূল্যবোধের সংস্কার প্রয়োজন। শিশুদের শুধু কিতাব মুখস্থ করানোই যথেষ্ট নয়, তাদের মানুষের মতো মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। নৈতিকতা, মানবিকতা এবং অপরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের শিক্ষা ছোটবেলা থেকেই দিতে হবে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে কঠোর নজরদারি ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে, যাতে পবিত্র স্থানগুলো কোনো বিকৃত মস্তিস্কের মানুষের অভয়ারণ্য না হয়ে ওঠে।

সবশেষে, আমাদের এই অন্ধবিশ্বাসে বুঁদ হয়ে থাকা মূর্খ সমাজকে জাগিয়ে তুলতে হবে। আর তার জন্য প্রয়োজন এক তীব্র মস্তিস্কের লড়াই। ক্ষমতার লোভ বা অন্ধ বিশ্বাসের কাছে নত না হয়ে, যেখানেই অন্যায় দেখব সেখানেই বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। আলো আর অন্ধকারের এই চিরন্তন লড়াইয়ে আমাদের বিবেককে জাগ্রত রাখতে হবে।

ফ্রেমের এই মানুষটি তাই শুধু ভাবছে না, সে আসলে চারপাশের এই ভন্ডামি আর অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে এক নীরব প্রতিবাদ জানাচ্ছে। এই চিন্তাই হোক আমাদের হাতিয়ার, এই কলমই হোক আমাদের প্রতিবাদ। আসুন, আমরা সমস্বরে আওয়াজ তুলি এই অন্ধকারের বিরুদ্ধে—আমাদের এই বৌদ্ধিক বিপ্লবের জয় হবেই!

লেখক: প্রাবন্ধিক, গবেষক ও আলোকচিত্রী।

পারিবারিক শিক্ষা বনাম রাষ্ট্রীয় অবক্ষয়: একটি বৌদ্ধিক বিপ্লবের ইশতেহার

সূচনার প্রেক্ষাপট: মহীরুহ বনাম শেকড়ের রসায়ন

একটি রাষ্ট্র যদি একটি বিশাল মহীরুহ হয়, তবে পরিবার হলো তার প্রাণদায়ী শেকড়। আমরা যখন একটি গাছের ডালপালা শুকিয়ে যেতে দেখি বা ফলকে বিষাক্ত হতে দেখি, তখন বুঝতে হবে সমস্যাটি ওপরের নয়, বরং মাটির গভীরে শেকড়ে পচন ধরেছে। বর্তমান বাংলাদেশে আমরা রাষ্ট্রীয় যে অবক্ষয়, নৈতিক স্খলন কিংবা দুর্নীতির মহোৎসব দেখছি, তা আকাশ থেকে পড়া কোনো পঙ্গপাল নয়; বরং এটি আমাদের পারিবারিক শিক্ষার চরম সংকটের এক নগ্ন বহিঃপ্রকাশ। রাষ্ট্র কোনো বিমূর্ত সত্তা নয়; বরং রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিক একেকটি পরিবারের প্রতিনিধি। যখন পরিবার তার নৈতিকতা ও মূল্যবোধের পাঠ দিতে ব্যর্থ হয়, তখন রাষ্ট্রের প্রতিটি স্তম্ভে ধস নামা অনিবার্য।

অন্দরমহলের দায়বদ্ধতা: নৈতিকতার প্রথম পাঠশালা

মনস্তত্ত্ববিদরা বলেন, একটি শিশুর চরিত্রের ৭০ শতাংশ গঠিত হয় তার জীবনের প্রথম পাঁচ বছরে—যা সে পরিবার থেকে শেখে। অথচ আধুনিক অন্দরমহলগুলো আজ নৈতিকতার চেয়ে বস্তুগত অর্জনে বেশি মনোযোগী। একটি রাষ্ট্র যখন নৈতিকভাবে দেউলিয়া হয়ে পড়ে, তখন বুঝতে হবে সেই রাষ্ট্রের পরিবারগুলো ভেতর থেকে ক্ষয়ে গেছে। আমরা যখন বড় বড়

দুর্নীতিবাজদের ফাঁসি চাই, তখন আমরা ভুলে যাই যে সেই চোরটি একদিন কোনো না কোনো ঘরে বড় হয়েছে। যে মা-বাবা সন্তানকে অন্যের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে শেখান, তারাই পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ স্বৈরাচার তৈরি করছেন। রাষ্ট্রকে মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড় করাতে হলে প্রতিটি ঘরকে হতে হবে এক একটি ‘নীতিবিদ্যার ল্যাবরেটরি’।

চুরির হাতেখড়ি: পেন্সিল থেকে মেগা প্রজেক্ট

দুর্নীতির শেকড় কিন্তু সচিবালয়ে নয়, বরং শুরু হয় ডাইনিং টেবিল থেকে। শৈশবে যখন একটি শিশু অন্য সহপাঠীর পেন্সিল বা টিফিন বক্স চুরি করে বাড়ি ফেরে এবং মা-বাবা তাকে শাসন না করে ‘বুদ্ধিমান’ বা ‘চালাক’ বলে প্রশ্রয় দেন, ঠিক ওখান থেকেই শুরু হয় রাষ্ট্রীয় লুণ্ঠনের প্রথম পাঠ। যে হাত শৈশবে অন্যের হকে ভাগ বসাতে আনন্দ পায়, সেই হাতই বড় হয়ে রাষ্ট্রের হাজার কোটি টাকার মেগা প্রজেক্টের বাজেট গিলে ফেলে। এই চারিত্রিক স্খলনের দায় রাষ্ট্রের চেয়ে পরিবারেরই বেশি। কারণ, পরিবার যদি শৈশবেই ‘সততার আভিজাত্য’ শেখাত, তবে রাষ্ট্রীয় আমলা বা রাজনীতিবিদরা লোভের কাছে মাথা নত করতেন না।

মেকি জিপিএ-৫ বনাম মানবিক বিবেক: সাফল্যের এক ভ্রান্ত ধারণা

আধুনিক পরিবারগুলো আজ একেকটি ‘রেজাল্ট উৎপাদনকারী’ কারখানায় রূপান্তরিত হয়েছে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত আমাদের সন্তানদের আমরা একটিই মন্ত্র জপ করি—’তোমাকে জিপিএ-৫ পেতে হবে’। এই অসুস্থ প্রতিযোগিতার ইঁদুর দৌড়ে আমরা সন্তানদের বই মুখস্থ করাচ্ছি ঠিকই, কিন্তু তাদের শেখাচ্ছি না কীভাবে অন্যের ব্যথায় ব্যথিত হতে হয় বা একটি ক্ষুধার্ত মানুষের পাশে দাঁড়াতে হয়। যখন এই ‘যেকোনো উপায়ে সফল হওয়ার’ ভয়ঙ্কর নেশা নিয়ে একজন শিক্ষার্থী বড় হয় এবং রাষ্ট্রের নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে বসে, তখন তার কাছে বিবেক বা নীতিবোধ এক কাল্পনিক কৌতুক মাত্র। বর্তমান রাষ্ট্রীয় অরাজকতা আসলে আমাদের এই স্বার্থপর ও প্রতিযোগিতামূলক পারিবারিক শিক্ষারই চূড়ান্ত বিষফল। যে শিক্ষা কেবল ব্যক্তি-স্বার্থ শেখায়, তা কোনোদিন দেশপ্রেমিক নাগরিক উপহার দিতে পারে না।

ডিজিটাল ভ্রূণহত্যা ও অভিভাবকত্বের দায়

আমাদের রাষ্ট্রীয় অবক্ষয় আজ আর শুধু রাজপথ বা সংসদে সীমাবদ্ধ নেই; তা ঢুকে পড়েছে অন্দরমহলের শোবার ঘরেও। আমরা আধুনিকতার নামে

শিশুর হাতে স্মার্টফোন তুলে দিচ্ছি, কিন্তু তারা সেখানে কী দেখছে বা কী শিখছে—তা নিয়ে আমরা উদাসীন। যখন মা-বাবা শিশুর পাশে শুয়ে স্ক্রিনে আদিম উল্লাসে মত্ত হন, তখন সেই নিষ্পাপ চোখগুলো অজান্তেই অন্ধকারের ভাষা চিনে নেয়। একেই আমি বলছি ‘ডিজিটাল ভ্রূণহত্যা’—যেখানে শিশুর নৈতিক সম্ভাবনাগুলো বিকাশের আগেই মেরে ফেলা হচ্ছে। আমরা রাষ্ট্রকে গালি দিই, কিন্তু ঘরের কোণে বিষাক্ত ডিজিটাল ডিভাইসে নিজের সন্তানের ভবিষ্যৎ যে আমরা নিজ হাতে জবাই করছি—সেই নগ্ন সত্যটা স্বীকার করার সাহস আমাদের নেই। যে তরুণ সমাজ আজ ডিজিটাল উন্মাদনায় পথহারা, তাদের এই পথভ্রষ্ট হওয়ার পেছনে পরিবারের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উদাসীনতাই দায়ী।

সাংস্কৃতিক দেউলিয়াত্ব: অনলাইন আশীর্বাদ বনাম অভিশাপ

অনলাইন বা ইন্টারনেট আজ বিশ্বের সবচেয়ে বড় জ্ঞানভাণ্ডার হলেও আমাদের সমাজে এর ব্যবহার হচ্ছে ভিন্নভাবে। টিকটক বা রিলসের নামে যে কুরুচিপূর্ণ অঙ্গভঙ্গি আর সস্তা জনপ্রিয়তা পাওয়ার লড়াই চলছে, তা এই প্রজন্মের নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে চুরমার করে দিচ্ছে। পরিবার যখন তার সন্তানদের এই সাংস্কৃতিক দেউলিয়াত্ব থেকে রক্ষা করতে পারে না, তখন সেই সমাজজুড়ে এক ধরণের ‘মানসিক পঙ্গুত্ব’ তৈরি হয়। ডাইনিং টেবিলে বসে মা-বাবা যখন অন্যের গিবত গান এবং পরমত সহিষ্ণুতাকে দুর্বলতা মনে করেন, তখন সেই পরিবার থেকে সহনশীল নাগরিক আসার কোনো সুযোগ থাকে না। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অন্যের চরিত্র হনন করার যে পৈশাচিক আনন্দ আজ তরুণদের মাঝে দেখা যায়, তা আসলে তাদের পারিবারিক শিক্ষারই এক ধরণের নেতিবাচক প্রতিফলন।

রাষ্ট্রীয় অবক্ষয়: যেখানে নিয়মই অনিয়ম

রাজনৈতিক অস্থিরতা, বিচারহীনতা এবং দুর্নীতির যে জয়জয়কার আমরা চারপাশে দেখি, তা একদিনে তৈরি হয়নি। রাষ্ট্রীয় এই অবক্ষয় আসলে লক্ষ লক্ষ পরিবারের ব্যর্থতার এক সামষ্টিক ও বীভৎস রূপ। রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতিটি কলকব্জা যখন ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহৃত হতে শুরু করে, তখন বুঝতে হবে সেই চালকদের পারিবারিক বুনন ছিল নড়বড়ে। যখন একজন অভিভাবক তার সন্তানকে শেখান ‘যেকোনো উপায়ে জয়ী হওয়াই বীরত্ব’, তখন সেই সন্তান বড় হয়ে রাষ্ট্রকে লুটপাট করতে দ্বিধা করে না। আদর্শিক নেতৃত্ব আকাশ থেকে পড়ে না; তা তৈরি হয় প্রতিটি ঘরের পড়ার টেবিলে এবং মা-বাবার জীবনাচরণে। পরিবার যখন তার সন্তানদের দেশপ্রেমের চেয়ে ব্যক্তিকেন্দ্রিক ভোগবাদ বেশি

শেখায়, তখন রাষ্ট্র তার নৈতিক অভিভাবকত্ব হারায়।

বৌদ্ধিক বিপ্লব: সংস্কারের শুরু হোক ঘর থেকে

আমরা প্রায়ই রাজপথে বিপ্লবের কথা বলি, রাষ্ট্র সংস্কারের স্লোগান দিই; কিন্তু আসল বিপ্লবটা হতে হবে আমাদের মনস্তত্ত্বে। এই বৌদ্ধিক বিপ্লবের প্রথম ধাপ হতে হবে প্রতিটি পরিবারের অভ্যন্তরে। রাষ্ট্রীয় সংস্কার কোনো ওপরতলার প্রশাসনিক হুকুম বা আইনি কাঠামো দিয়ে স্থায়ীভাবে সম্ভব নয়, যতক্ষণ না নাগরিকের চারিত্রিক ভিত্তি মজবুত হয়। নৈতিকতা, সত্যবাদিতা এবং পরমতসহিষ্ণুতার যে শিক্ষা আমাদের পরিবারগুলো থেকে হারিয়ে গেছে, তা পুনরুদ্ধার করাই হোক এবারের সংগ্রাম। রাষ্ট্রকে দোষারোপ করার আগে আমাদের আয়নার সামনে দাঁড়াতে হবে এবং দেখতে হবে আমরা প্রতিটি ঘর থেকে সমাজকে কেমন মানুষ উপহার দিচ্ছি।

উপসংহার: আগামীর দায়বদ্ধতা ও প্রতিরোধের দুর্গ

পারিবারিক শিক্ষা এবং রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা একে অপরের পরিপূরক। একটি ছাড়া অন্যটি অচল। আমরা যদি আগামীর সুন্দর একটি বাংলাদেশ বা একটি মানবিক সমাজ বিনির্মাণ করতে চাই, তবে পরিবারকে তার আদি পরিচয়ে ফিরে যেতে হবে—অর্থাৎ একটি ‘নৈতিক পাঠশালা’ হিসেবে নিজেকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। রাষ্ট্রীয় অবক্ষয়ের এই করাল গ্রাস থেকে বাঁচতে পরিবারকেই হতে হবে নৈতিক প্রতিরোধের প্রথম দুর্গ। মনে রাখতে হবে, সমাজ বা রাষ্ট্র পরিবর্তনের চাবিকাঠি কোনো নেতার হাতে নয়, বরং প্রতিটি সচেতন মা-বাবার হাতে। ঘরের দেয়ালগুলো যদি সততার পাঠ দিতে শুরু করে, তবে রাষ্ট্রের রাজপথগুলো এমনিতেই কলঙ্কমুক্ত হবে।

গাংনীতে সামাজিক অবক্ষয় রোধে শিক্ষার্থীদের করণীয় শীর্ষক

কর্মশালা

মেহেরপুরের গাংনীতে অরাজনৈতিক ও শিক্ষা বিষয়ক সামাজিক সংগঠণ ‘প্রস্ফুটন’ এর উদ্যোগে সামাজিক অবক্ষয় রোধে সচেতনতা সৃষ্টি ও নেতৃত্ব বিকাশে শিক্ষার্থীদের করনীয় শীর্ষক কর্মশালা ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়েছে।

গতকাল রবিবার হাড়াভাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। প্র্রাক্তন শিক্ষক মুহাম্মদ নিয়ামত উল্লাহর সভাপতি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা প্রীতম সাহা।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাড়াভাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সাইদুল হাসান পলাশ, সাহেবনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুর রশিদ, প্রষ্ফুটনের উপদেষ্টা মোহাম্মদ সালমান সাইফ, দেলোয়ার জাহান ঝন্টু। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, প্রস্ফুটন বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি ও স্কুল প্রোগ্রামের আহবায়ক সদস্য সাহান উল্লাহ, মাকসুদুল আজম বাঁধন।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন প্রস্ফুটন সদস্য মো: মিফতাহুল ইসলাম।

অতিথিরা কুইজ অনুষ্ঠানে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ এবং বৃক্ষরোপন কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। উদ্বোধন শেষে শিক্ষার্থীদের হাতে দুটি করে গাছ রোপনের জন্য তুলে দেয়া হয়। অনুষ্ঠানে ৩০০টির মতো গাছ শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণ করা হয়।

উল্লেখ্য, তীব্র তাপ প্রবাহের কারে প্রস্ফুটন বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি ও স্কুল কর্মশালা শুরু করেছে । এ বছর প্রস্ফুটন প্রায় ৫০০০ এর অধিক গাছ লাগানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষার্থীদের মাঝে গাছগুলো পর্যায়ক্রমিকভাবে বিতরণ করা হবে।
‘প্রস্ফুটন’ মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের দ্বারা পরিচালিত একটি অরাজনৈতিক এবং অলাভজনক শিক্ষা ও সমাজ কল্যাণ সংঘ। ‘শিক্ষা ও ঐক্যে আনি মুক্তি’ এই স্লোগানে ২০১৩ সাল থেকে কল্যাণমূলক এই সংঘটি সফলতা ও সুনামের সাথে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।